গল্পের কলকাতা, কলকাতার গল্প

বরেন্দু মন্ডল

প্রিয় কবির মতো একদিন আমিও প্রথম জুতোপালিশওয়ালা দেখেছিলাম শিয়ালদায়- তোমার মনে আছে কলকাতা। কলকাতা থেকে দূর ভূগোলের মানুষ আমি। বদলির চাকরি নিয়ে বাবাকে থাকতে হতো কখনো অসম, কখনো দিল্লি। ইম্ফল, জম্মু কখনো বা ছুটিতে। ফেরার সময় আমার জন্য কখনো নিয়ে আসতেন কোমরের বেল্ট, ভাইয়ের জন্য নতুন খেলনা এরোপ্লেন আর দিদির জন্য ফোল্ডিং ছাতা। মাটির স্কুল বারান্দায় বসে ছেলেবেলায় বন্ধুদের দেখাতাম সেসব। ওরা জিজ্ঞাসা করলে কতো গর্ব করে বলতাম— এসব কলকাতা থেকে আনা। অথচ বাবা আনতেন তাঁর চাকরিস্থলের ক্যান্টিন থেকে। সেনাবাহিনীতে চাকরি ছিল তাঁর। আসলে কলকাতা, অসম, ইম্ফল দিল্লির মধ্যে কোনো ব্যবধান তখন ছিলো না আমার কাছে। প্রান্ত - দক্ষিণের পরশমণিতে ঐ শহরগুলোর আলাদা কোনো আইডেন্টিটি ছিল না কোনোদিন। আজ বুঝি জন্মলগ্ন থেকেই কলকাতা তার শ্রেণিচরিত্রে কতোটা আলাদা। জন্মলগ্ন থেকেই সে আকর্ষণজীবী। ছেলেবেলায় কলকাতাকে ভেবে ছিলাম যেভবে - সে ভাবে দেখিনি তাকে। কৈশোরে যে ভাবে দেখেছি কলকাতাকে - যৌবনে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার দিনগুলোতে তাকেই আবার পেয়েছি অন্যভাবে। কিন্তু একটা ছিলই , তা হল বদলে যাওয়া আমি আর বদলে যাওয়া কলকাতা। ঠিক এভাবে না হলেও বাইরে থেকে আমরা যারা কলকাতায় এসেছি— তাদের কাছে কলকাতাকে দেখা, কলকাতাকে পাওয়া মোটের উপর এরকমই। শোভাবাজার মেট্রোস্টেশনের নামের নিচে যেদিন সুতানুটি লেখাটা বসল খুব ঢাকঢোল পিটিয়ে —বাগবাজারের এক কলকাতাইয়া বন্ধু সেদিন পরম আনন্দে জানালেন—'সুতানুটিটা লিখে দিলাম'। 'দিলাম' শব্দটার মধ্যে কতোটা অহং আছে বুঝেছিলাম সেদিন। 'দিলাম' শব্দটার ঐ ধ্বনিপ্রয়োগ অবশ্য বদলে যাওয়া কলকাতার শ্রেণিচরিত্রকেই প্রকাশ করে দেয় সহসা। মানুষের কাছ থেকে আঘাত পেয়েছি যখন, ছবির কাছে গেছি তখন আরেক কলকাতাকে খুঁজে। টালা থেকে টালিগঞ্জের কলকাতাটা তো আমাদের চোখের সামনেই ব্যারাকপুর থেকে বারুইপুর ছাড়ালো! ট্রাম লাইন কোথাও উধাও হলো শহরের চাপে– কোথাওবা সেমিনারি যুক্তিতে নতুন করে হলো পাতা। ট্রামে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে আর যাওয়া যায় না বলে স্মার্ট কার্ডে মেট্রো চড়ে কলকাতাকে দেখি। কবিতায় না পেলে তাকে খুঁজি গল্পে। আমার সামনে তখন উঠে আসে গল্পের কলকাতা, কলকাতার গল্প।

'কলিকাতার চড়ক পার্ব্বণ' -এর কথা বলতে গিয়ে হুতোম ওঁর নিজের সময়ের কলকাতার যে চলমান বাস্তবতার কথা লিখেছিলেন 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' -র পাঠক মাত্রই তা জানেন : অ্যাং যায়, ব্যাং যায়, খলসে বলে আমিও যাই– বামুন কায়েতরা ক্রমে সভ্য হয়ে উঠলো দেখে সহরের নবশাক, হাড়িশাক, মুচিশাক মহাশয়রাও হামা দিতে আরম্ভ করলেন– ক্রমে ছোটজাতের মধ্যেও দ্বিতীয় রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যেসাগর ও কেশন সেন জন্মাতে লাগলো – সন্ধ্যার পর দুগাছী আটা ও একটু ন্যাবড়ানের বদলে - ফাউলকারী ও রোল রুটী ইন্ট্রডিউস হলো। শ্বশুরবাড়ী আহার করা, মেয়েদের বাঁ নাক বেঁধান চলিত হলো দেখে বোতলের দোকান, কড়িগণা মাকুঠেলা ও ভালুকের লোম ব্যাচা, কলকেতায় থাকতে লজ্জিত হতে লাগ্‌লো। থরকামান চৈতন্য ফক্কার জায়গায় আলবার্ট ফেসান ভর্তি হলো। চাবির থলো কাঁদে করে টেনে ধুতি পরে দোকানে যাওয়া আর ভালো দেখায় না, সুতরাং অবস্থগিত জুড়ী, বগী ও ব্র্যাউহাম বরাদ্দ হলো। হুতোমের এই কলকাতার সঙ্গে নিশ্চয়ই মেলে না 'মহর্ষি' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী'-র কলকাতার ছবি কথা। জোড়াসাঁকোর ঐ বিখ্যাত বাড়িটার পরিসর, চিন্তনের সঙ্গে বাইরের কলকাতার নৈকট্য ছিল না– ব্যবধান ছিল যতখানি। শেষ সতেরো ও আঠারো শতকের কলকাতার কথা আছে পুরোনো বাংলা গদ্যে, দলিল দস্তাবেজে আর ইতিহাসের গবেষণা পত্রে। তুলনায় উনিশ শতকের বাংলা প্রহসনে, আত্মজীবনীতে উনিশ শতকের কলকাতার কথা এসেছে ব্যাপকভাবে। যদিও প্রকৃত তুলনামূলক পাঠ সেই কলকাতার আসল ইতিহাসকে সামনে আনতে পারে। দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী' -র গুরুগম্ভীর ভাব আসলে পুরো কলকাতা বা পুরো ঠাকুরবাড়ি তো নয়ই — ব্যক্তি দেবেন্দ্রনাথের বহুমাত্রিক জীবনের একটি দিককেই তুলে আনে। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ হয়ে সৌমেন্দ্রনাথ পর্যন্ত ঠাকুরবাড়ি থেকেই প্রকাশিত হয়েছে বেশ কয়েকটি আত্মজীবনী। আবার সেই সময়ে জোড়াসাঁকোর ঐ বাড়িটার অনতিদূরে রমরমিয়ে চলছে বটতলার ছাপাখানা। সেটা আরেকটা কলকাতা। বটতলার ছাপাখানার বই ঠাকুরবাড়িতে পৌঁছে যেত এবং রসিয়ে রসিয়ে পড়তেন কেউ কেউ - ঠাকুরবাড়ির ভেতরে আরেকটা ঠাকুরবাড়ির সেই গল্প তো সাধারণ পাঠকই জানেন। এভাবেই - কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে।

ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় বিশ শতকের শেষার্ধ এবং নতুন সহস্রাব্দীর এই প্রথম দশকের কলকাতার ছবি - কথা, সমাজ - সংস্কৃতি, ইতিহাস - ইতিকথা, বদলে যাওয়া পরিসর, রাস্তা - গলি, বদলে যাওয়া মন - মনন বাংলা ছোটগল্পই ধারণ করেছে সবচেয়ে বেশি। নাগরিক মধ্যবিত্তের আজকের সংকট সেদিনের কলকাতায় ততটা ছিল না– স্বাভাবিক কারণেই রবীন্দ্রনাথের গল্পে তাকেই মোটা দাগে পেতে চাওয়াটা অমূলক হবে। কল্লোলীয়দের গল্পেই আমরা প্রথম কলকাতা এবং কলকাতার মেট্রোপলিটন মধ্যবিত্তের মন - মনন, সমাজ - ইতিহাসের শিল্পরূপকে প্রত্যক্ষ করি- স্মরণে রাখতে হয় সময়ের পথ কলকাতা ততদিনে পেরিয়ে এসেছে অনেকখানি। জীবনানন্দের গল্পের কলকাতা আর কমলকুমারের গল্পের কলকাতাও তাই ভিন্নতর। সমকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনও কলকাতার ওই সামগ্রিক পরিবর্তনকে সংগঠিত করে তুলেছে। ইতিমধ্যে কলকাতার ভৌত কাঠামোরও পরিবর্তন ঘটে চলেছে। তিরিশ - চল্লিশের বাংলার সঙ্গে তাই মেলে না জোয়ার ভাটায় ষাট - সত্তর। উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লবের নতুন অভিমুখ যেন তৈরি হয় সত্তরের মুক্তির দশকে। গ্রুপ থিয়েটার এবং বাংলা গল্পে আছে তার সবটুকু রণরণি, পথচলার সবটুকু ইতিহাস।

আমরা মূলত নতুন সহস্রাব্দীর গল্পকারদের গল্প থেকে আজকের কলকাতাকে খুঁজবো। এই অন্বেষণ খন্ডিত জানি। কেননা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পের কলকাতা ছাড়া কি কলকাতার গল্পের আলোচনা পূর্ণতা পেতে পারে? জানি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, ননী ভৌমিক, ঋত্বিক ঘটক, কার্তিক লাহিড়ী, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, মতি নন্দী, রমানাথ রায়, সুব্রত সেনগুপ্ত, সাধন চট্টোপাধ্যায়, নবারুণ ভট্টাচার্য, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কিন্নর রায়ের গল্পের আলোচনা 'গল্পের কলকাতা, কলকাতার গল্প' শীর্ষক প্রবন্ধকে

পূর্ণতা দিতে পারে। এও নিশ্চিত জানি অনেক নাম রয়ে গেল অনুল্লিখিত।

নতুন সহস্রাব্দীর প্রথম দশকের গল্পকার হিসেবে যাঁদেরকে এই আলোচনায় ধরতে চাইছি- তাঁরা সকলেই বাংলা গল্পভুবনের নতুন মুখ। স্বভাবতই অনেকের কাছে তারা হয়তো পরিচিত নন ততোটা, আবার এও হতে পারে- ব্যক্তিভেদে অনেকেই সুপরিচিত। বিষয়ের নিরিখে এই আলোচনায় তবু অনিবার্যভাবে হয়তো এসে যাবে সত্তর - আশির গল্পকারদের কয়েকটি গল্পের প্রসঙ্গ– নতুন কালের গল্পভুবনে প্রবেশের চাবিকাঠি হয়তো সদ্য প্রকাশিত ওই গল্পগুলো।

বিষয়ের নিরিখে অমর মিত্রের (জন্ম ১৯৫১) 'পাসিং শো' গল্পটিকে আমরা টেনে নেবো আমাদের এই আলোচনা বৃত্তে। অমর মিত্রের পাঠক মাত্রই জানেন– সাড়ে তিন দশক ব্যাপ্ত ওঁর আখ্যান— জীবনের মধ্যে থেকে এভাবে একটি মাত্র গল্পকে বেছে নেওয়া কতোটা ঝুঁকির, কতোটা কষ্টসাধ্য। শরু করেছিলেন ১৯৭৪ -এ, 'মেলার দিকে ঘর' গল্পটি লিখে। তারপর একে একে প্রকাশিত হয়েছে অমর মিত্রের অসামান্য সব গল্পসংকলনগুলো—'মাঠে ভাঙে কালপুরুষ' (১৯৭৮), 'দানপত্র' (১৯৮৬), 'আসনবনি' (১৯৯৩), 'অমর মিত্রের ছোটগল্প' (১৯৯৪), 'বসন্তবিলাস' (১৯৯৬), 'পাঁজার' (২০০১), 'শ্রেষ্ঠগল্প' (২০০৩) প্রভৃতি। পেশাগত কারণে প্রান্ত - কলকাতার জীবন ছেড়ে অমর মিত্রকে ১৯৭৪ -এ চলে যেতে হয়েছিল কংসাবতী, সুবর্ণরেখা, ডুলুং, কখনো -বা হলদি নদীর তীরে- মেদিনীপুরের গ্রাম জীবনে। ফিরে এসেছেন আবার শহরে— বদলে যাওয়া বেলগাছিয়া, টালাপার্কে। 'শ্রেষ্ঠগল্প'র শুরুতে 'অলীক এই জীবন' শীর্ষক ব্যক্তিগত গদ্যে সুন্দর করে বলেছেন অমর আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টি কাটিয়ে দিচ্ছি দূর গ্রামের পথে মাঠ ভাঙতে ভাঙতে।...১৭বছর একটানা ঘুরে, সাময়িক নগর উপান্তে এসে আবার দূরে চলে গিয়ে যখন নিজের শহরে এসে আবার স্থিত হলাম, তখন অবাক হয়ে দেখি– যে শহরকে চিনতাম বাল্যকাল থেকে এই সেই শহর নয়।...কলকাতাকে আমি চিনতে পারতাম না-মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, দক্ষিণ, উত্তর ২৪ পরগণার গ্রাম না দেখলে। আমি চিনতে পারতাম না প্রতিবেশী কন্যাটিকে, প্রতিবেশী পুরুষটিকে, নিষ্ঠুর মধ্যবিত্তকে, কোমল মনের গৃহবধূটিকে। আমাদের আলোচ্য 'পাসিং শো' গল্পটিতে আমরা পাবো অমরের জীবনদর্শনের শিল্পরূপ। ৬ জুলাই ২০০৮ একটি বহু প্রচারিত সংবাদপত্রের রবিবাসরীয় পাতায় প্রকাশিত এই গল্পটিতে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে আমরা পাই ব্রতীনকে– যিনি কাফে - ক্রেডিট কার্ড, আইফোন - আইপড, মাল্টিপ্লেক্স - শপিংমল শাসিত এই কলকাতার মধ্যে থেকে খুঁজে পেতে চান অনেক অনেক দিন আগের কলকাতা, অর্ধশতাব্দীরও আগে বয়ে যাওয়া জীবনের সেই পুরাঘটিত অতীতকে ফিরে পেতে চান— আজকের এই ঘটমান বর্তমানের কলকাতায় দাঁড়িয়ে। ব্রতীন এমনই। পঞ্চাশ পেরোনোর পর ব্রতীন শুধু পুরনো জিনিস খুঁজে বেড়ায়। ব্রতীন কিছুতেই বুঝতে চায় না তার পঞ্চাশ, মানে পঞ্চাশটি বছর গেছে এ পৃথিবীরও। দাম্পত্যের এতোটা দিন পেরিয়ে এসেও বিয়াল্লিশের নীলিমাও ততটা বুঝতে পারেন না ব্রতীনকে। নীলিমা এক সন্ধ্যেয় জিজ্ঞেস করল, তোমার আসলে কী হয়েছে বলো দেখি? জানি না, মনে হচ্ছে সব বোধহয় হারিয়ে যাচ্ছে। ওর বাবা - মা ছেড়ে এসেছিলেন কপোতাক্ষ। আজ ব্রতীন ছেড়ে যাচ্ছেন কোন নদী? সেই পুরনো বাড়ি ভেঙে ভাগে পাওয়া দু'কামরার এই ফ্ল্যাট— তার এক চিলতে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ব্রতীন আজ খুঁজে পেতে চাইছেন কোনো এক মার্চের সন্ধ্যা—সন্ধ্যা জুড়ে 'অভিমান আর নয় আর নয় আর',সেই রেকর্ডের উল্টোদিকে 'নদীটি গিয়াছে চলিয়া...নদীটি গিয়াছে...'। কোনো কিছু হারায় না কখনো—বাবার হাতে ফোটানো টবের গোলাপ গছের গন্ধ, বার্মাটিকের পাল্লা জোড়া আয়না বসানো আলমারি, সোফাসেট, পুরানো গান, বাবার হাতের পাসিং শো সিগারেট, ম্যাকার্থি লেন— হারায়নি কিছুই। গালে পাকা দাড়ি, মাথা ভর্তি সাদা চুল, সত্তরের চেক লুঙ্গি গুলাম হুসেন পুরোনো রেকর্ড বিক্রেতা বাসে চাপেন না, পায়ে হেঁটেই পৌঁছে যান শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। 'কলকাত্তা থেকে কলকাত্তা চলিয়া গিয়াছে সাব' তবু গুলাম হুসেন এই কলকাতার অলিগলি পেরিয়ে আজ ব্রতীনকে কোথায় পৌঁছে দিতে চান? গুলাম হুসেন গুন গুন করে একবার, নদীটি গিয়াছে চলিয়া—চলিয়া গিয়াছে—মারোয়া হতে পারে, পূরবী ও আপনা পিতাজি কী সুন্দর লিখেছিলেন, শুনে হামার কত নদীর কথা মনে পড়ে, পানি নাই শুখা হয়ে পড়ে থাকছে, মানুষ ভি নদীর মতো হয়ে যাচ্ছে, শুখা দয়া-মায়া নাই, কলকাত্তা ভি অমন হয়ে যাচ্ছে। তবু শেষপর্যন্ত তাদের পথ গিয়ে পৌঁছয় নির্মীয়মান একটি বহুতলের পিছনে, একটা ঘুপচি ঘর- অন্ধকারে তার ভেতরে বাজছে 'নদীটি গিয়াছে চলিয়া...। রেকর্ডটা বাজলেই অতুলানন্দের পাগলা ছেলেটা শান্ত হয়ে যায়। বাবার গান শুনলে ও ছেলের আঁখিতে নিদ আসে সাব। শুনতে থাকে ব্রতীন— গুলাম হুসেনের কথা, ওর বাবার লেখা অতুলানন্দের কণ্ঠের গান। মাটিতে উবু হয়ে বসে পড়ে ব্রতীন- গানে গানে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে উন্মাদ পৃথিবী। ব্রতীন অন্ধকারে দেখতে পেল গানের নদীর ধারে দাঁড়িয়ে গোরা সায়েব। মাথায় সেই টুপি। সেই চাহনি। অবিকল সেই রকম। প্রোমোটার-সংস্কৃতি এর সবটুকু এখনও মুছে ফেলতে পারেনি।

২৮ অক্টোবর ২০০৭ 'সংবাদ প্রতিদিন' -র রবিবারের পাতায় ছাপা গৌর বৈরাগী (জন্ম - ১৯৮৫)-র 'শোক' গল্পটি যখন এই অক্টোবরে (২০০৮) প্রবন্ধের বিষয় হয়ে উঠতে চাইছে- তখনও অপরিবর্তিত আমাদের জাতীয় - আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা। হয়তো কাকতালীয় তবু সকালের কাগজে আজই দেখলাম কালীপুজোর মুখে অকাল মেঘে ঢেকেছে কলকাতার আকাশ - ফ্রন্ট পেজের একদিকে সুমন বল্লভের তোলা ছবি। ফ্রন্ট পেজের ডান দিকে ঐ বহুল পরিচারিত দৈনিকে ছাপা হয়েছে মুম্বাই শেয়ারবাজারের সামনে রাখা বুলের মূর্তিতে পুজো করছেন একজন লগ্নীকারী, শিল্পমহল আস্থা হারাচ্ছেন। গত কয়েক বছরে প্রবল গতিতে দৌড়ে যে সেনসেক্স ২১ হাজার ছুঁয়েছিল- গত ২৫ অক্টোবর ২০০৮ তা ৮৭০১.০৭ -এ পৌঁছিয়েছে। ২৪ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর সেনসেক্স পড়েছে ১০৭১ পয়েন্টে। ইউরোপের ১৫টি দেশ এই আর্থিক মন্দার কবলে– সেখানে শেয়ার বাজারের দাম পড়েছে ৭ শতাংশ। পতনের ক্ষেত্রে জাপানের অবস্থা অরাও করুণ- ১০ শতাংশের মতো সেখানেও পড়েছে শেয়ারের দাম। গত কয়েকদিনে বিদেশী আর্থিক সংস্থাগুলো বাজার থেকে তুলে নিয়েছে ১১০০ কোটি মার্কিন ডলার, মিউচুয়াল ফান্ডের ফিক্সড ম্যাচ্যুরিটি থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে ৩০ হাজার কোটি টাকা। মন্দা মোকাবিলা ও আগামী মাসের জি-২০ ওয়াশিংটন সম্মেলনে ভারতের অবস্থান ঠিক করতে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের নির্দেশে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে মিলিত হতে চলেছেন অর্থমন্ত্রী পলনিয়প্পন চিদাম্বরম, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর ডি সুব্বারাও, যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিংহ অহলুওয়ালিয়া, অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান বিজয় কলেকর প্রমুখ। সূচক নামছে। নামছে তবুও। অগত্যা বুলের মূর্তিকে পুজো করেছেন কোনো এক লগ্নীকারী। দুশ্চিন্তার মেঘে মেঘে ঢেকে গেছে তারও আকাশ। এই খবরগুলো একটা প্রতীকের নয়। 'শোক' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রতীক অফিসে চলে গেলে তৃষার ব্যস্ততা একটুখানি কমে। তখন খবরের কাগজের কেজো খবরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা পুলিশের ছোড়া কাঁদানে গ্যাসের শেল

ফেটে বলরাম মাঝির মৃত্যুর মুখোমুখি হয় তৃষা। বাঁকুড়ার অজ-পাড়াগাঁয়ের এই প্রান্তিক মানুষগুলো দিনের পর দিন রেশন না পেয়ে ডিলারের গুদাম পুড়িয়ে দিয়েছিল। প্রতীক সেভাবে লক্ষ্য করেনি ছবিটি। ফ্রন্ট পেজে ক্লোজ আপে হাসিমুখে প্রধানমন্ত্রীর ছবির ঠিক নিচেই ছিল ছবিটি— খেতে না পাওয়া বন্ধ- চা বাগানের একজন বেকার শ্রমিকের অনাহার ক্লিষ্ট মুখ! ভেতরে তৃতীয় পৃষ্ঠায় চতুর্থ কলমে ছোট্ট করে ছাপা আরেকটা ছবি– নীলমাধব সরকার। ওর ট্যাক্সিতে ফেলে যাওয়া পঞ্চাশ হাজার টাকার বান্ডিল লোকটা থানায় জমা দিয়ে ফিরে এসেছে– টালির চালায় বিধমা মা, অবিবাহিত বোন, দুটো বেকার ভাই, নিজেরও ছোট্ট ছোট্ট দুটির কাছে। আশ্চর্য এক হাসি ছড়িয়ে ছিল লোকটার মুখে। তৃষা দেখে ফেলেছিল সেই হাসি। সে সব কাগজের মুখোমুখি হয়েছিলাম আমি, আজ সকালে– কোনো এক বলরাম মাঝি, নীলমাধব সরকারের খবর সেখানে ছিল না কী? মুখ আর নামগুলো বদলে তারাই আসেনি কী কেজো খবরের আড়ালে, আবডালে? খবরের কাগজে প্রধানমন্ত্রীর প্রতীকী হাসি দেখে প্রতীক তৃষার জন্য পুজোর সারপ্রাইজ ঘোষণা করে। দিনের শেষে ফিরে আসে জয়ীর মতো— তিরিশ করে কেনা আইকনের গতকাল দর ছিল একশো পঞ্চাশ, আজ বাজার ওপেন হতেই একশো সত্তর। তিনহাজার টাকা তিনবছরে সতেরো হাজার টাকা দিচ্ছে তাকে। ওর সঙ্গে এসেছে রণজয়, দুজনে মিলে একটা বড়ো শেষ করবে তারা আজ। প্রতিদিনের সকালের মতো করে আবার সকাল হবে। সকালবেলা মরার সময়টুকু পর্যন্ত থাকবে না তৃষার। আবার তৃতীয় পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের কোনো খবর। আবার মুখ বদলে যাওয়া কোনো বলরাম মাঝি অথবা নীলমাধব সরকার। অলস বিকেলে একা ব্যালকনি— যেখানে রেয়ার অর্কিডের পাশে অযত্নের উচ্ছেগাছ। প্রতীকের কোনো ফোন। চিকেন পকোড়ার ফরমাস অথবা সেনসেক্সের মতো অফিস ফেরত প্রতীকের মুখ। মেট্রোপলিটন মনের এ এক নিত্যযাপন। 'কাটবাদাম গাছ', 'গৌর বৈরাগী-র গল্প', 'মুকাভিনয়ের একদিন' 'অপার্থিব' গল্প সংকলনে ছড়িয়ে আছে এমনতর সব বীক্ষা। প্রতিদিনের চেনা জীবন, চেনা নাগরিক মধ্যবিত্তের মন, চেনা দেশ - কালকে গৌর বৈরাগী তাঁর গল্পের বাস্তবতায় তুলে আনেন এভাবেই। এ তাঁর আখ্যানব্যক্তিত্বের নিজস্ব অর্জন।

খুব কম পড়েছি তাঁকে। তবু যতটুকু জেনেছি তাঁর গল্পভুবন– তাতে এটুকু বুঝেছি, গল্পকে কীভাবে জমিয়ে দিতে হয়- তা ভালো করেই জানেন গল্পকার সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় (জন্ম ১৯৬১)। সুকান্ত প্রথমত- ঔপন্যাসিক, দ্বিতীয়ত- গল্পকার। বাংলা আখ্যানের ইতিহাসে সে উদাহরণ অপ্রতুল নয় যদিও তবু, সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ে ঔপন্যসিক ব্যক্তিত্ব ওঁর গল্পব্যক্তিত্বকে প্রতিহত করেনি। 'প্রত্নকন্যা', 'পিতৃপক্ষ', 'মল্লারপুর', 'যে-বৃষ্টির জন্ম হয়নি', 'আদিম জনপদ', 'অবুঝ মেয়ে', 'প্রাণের মানুষ', 'দেখে পার হবেন', 'মেঘেদের ঘরবাড়ি'-র সফল ঔপন্যাসিককে তাই আমরা পেয়েছি 'বিকেলের আলো', ' ফাল্গুনের গন্ধ' সংকলনের সফল গল্পকার হিসেবেই। ওঁর 'পাখি - পালক' গল্পটির কথা মনে পড়ছে— আমাদের বর্তমান আলোচনার সাপেক্ষে। গল্পের পটভূমি উত্তর কলকাতা— আরও নির্দিষ্ট করে বললে শ্যামপুকুর - হাতিবাগান। কলকাতার পাখিপোষা বা বাবুদের পাখি - বিলাস ব্যক্তি আমাকে ছুঁয়ে যায় খুব– বদলে যাওয়া আজকে কলকাতায় সেই জীবনটা আর নেই বলেই, নাকী ব্যক্তিগত কোন প্যাশান্– কী জানি? শিবেন - অলির গল্পটা হয়তো শেষ পর্যন্ত কোনো বদলে যাওয়া কলকাতার বা কলকাতার শ্রেণিচরিত্রের কথা বলে না- বলার দায় বা প্রতিশ্রুতি যদিও নেই গল্পকারের। শিবেন - আলির দাম্পত্য ও দাম্পত্য সংকটের গল্পটা কিন্তু শেষপর্যন্ত কলকাতার মধ্যে লুকিয়ে থাকা আরেকটা কলকাতার কথা বলে। আটপৌরের ঘরের ছেলে শিবেন। ছোটোবেলায় যখন ওর মা মারা যান– হয়তো মাকে ভুলে থাকার জন্যই বাড়ির ছাদ জুড়ে বিরাট এক এভিয়ারী বানিয়ে ছিলেন বাবা। ছোটো থেকেই শিবেনের পাখির শখ। শ্যামপুকুর স্ট্রিটে ওদের ছোট্ট দোতলা বাড়িকে সবাই 'পায়রা বাড়ি' বলে জানে। বুলবুলির লড়াইয়ের আয়োজন হয়তো আর করেন না কোনো শেষ পাখিবাবু - তবু মল - ফ্ল্যাট সংস্কৃতির দাপটে উত্তর কলকাতার সব পায়রা বাড়ি এখনও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। এই পাখির চরাচরে শিবেন কাটিয়ে দিয়েছে জীবনের বত্রিশটা বছর। সরকারি ছোট্ট একটা চাকরি জুটেছে, বিয়েও হয়েছে বছর - দুই- অথচ শিবেন মগ্ন পাখির চরাচরে। দাম্পত্যের সেই অনুপস্থিতির সরু গলিপথে অলির জীবনে এসেছে দ্বিতীয় পুরুষ। দাম্পত্যের বিশ্বাস ও বিশ্বাস - ভঙ্গের মোকাবিলায় এক আশ্চর্য পাখির গল্প অলিকে বলেছিলেন শিবেন। রামগঙ্গারা— গাছের গর্তে বসে হিস্ হিস্ শব্দ করে থুথু ছিটিয়ে অবিকল সাপেদের মতন। কোটি কোটি বছর আগে এরা তো সরীসৃপ ছিল, এত বিবর্তনের পরেও কিছু কিছু পাখির মধ্যে সরীসৃপের ঐতিহ্য লুকিয়ে আছে। আজও কাটাতে পারেনি তারা। এ গল্প শোনার পর আর ঘুম আসেনি আলির। শিবেনের কাছ থেকে তখন অনেক দূরের মানসী আলি। সেদিন প্রথম সকালে ফোনে যখন সব ঠিকঠাক–প্রথম কদিন উঠতে হবে ডায়মন্ডহারবারের কাছে কোনো একটা হোটেলে, তখন টেলিফোনের তারে একটা ল্যাজঝোলা পাখি লেজ তুলে সি-ই-ই...চি-ই-প...চিপ্ -চিপ্ - চিপ্ ডেকে ছিল বারংবার। সব কি পাখিটা শুনে নিল? পাখিটা না বলে দেয় শিবেনকে। চমকে উঠেছিল অলি। আর একটাও পাখি নেই শিবেনের তবু পাখিদের জন্য উৎকণ্ঠা রয়ে গেছে। শ্যামপুকুরের 'পায়রা - বাড়ি'র চারদিকে তখন জীবনানন্দের সেই লাইন দুটোর অক্ষর কমা ড্যাশ রেফেরা যেন ঘোরে- নীড় নেই, পাখিরও মতন কারো হৃদয়ের তরে পাখি নেই। গল্পটা এগোয় একটা ম্যাজিকের দিকে অথবা গল্পটাই ম্যাজিক হয়ে উঠতে চায়। ফিরে এসেছে আলি অথবা ফিরে আসেনি কেউ, কেউ ফেরে না কখনো- তবু যেন কেউ ফিরেছে আবার। বউমার জন্য আমাদের পারিবারিক সম্মান ধুলোয় মিশেছে। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। একে একে সব পাখি চলে গেছে, মরে গেছে। ওকে আর এখানে রাখিস না, সোজা ঘাড় ধরে বার করে দে। বলে যাচ্ছিল ওর বাবা, আর তখন নিজের ঘরে একটা হাত অলির পথক্লান্ত ডানায় রেখে, মনে মনে শিবেন বলে চলে পাখিরা ঠিক কী কারণে যে পরিযায়ী হয় আজও তা জানা যায়নি অলি। ঠিক তখনই সিঁড়ির নীচে পায়চারি করতে থাকে শিবেনের বাবা দেখতে পান বাগানের মাটি ফুঁড়ে এক এক করে পাখি বেরিয়ে আসছে। রামধনু টুকরো হয়ে যাওয়া রং তাদের পালকে। এইসব মরা পাখি তিনি ওই বাগানে পুঁতে দিয়েছিলেন। পাখিগুলো উড়তে ছেলের ঘরের জানালায়, কার্ণিশে গিয়ে বসছে। কী মন ভোলানো ওড়া, কিচ মিচ শব্দ। শিবেনের বাবা পাখিগুলোর দিকে চেয়ে ভাবতে থাকেন কে বলবে অ্যাতো সুন্দর সুন্দর পাখিগুলো কোনও এককালে সরীসৃপ ছিল। সে অবশ্য কোটি কোটি বছর আগের কথা। গল্পটা তখন উড়াল দেয়। বিষয়ের নিদিষ্ট ছকে তাকে আর বাঁধা যায়না তখন। বাঁধার জন্যও নয় আমাদের এই আয়োজন। বেশ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ গল্প লিখে ইন্দ্রাণী লস্কর সচেতন পাঠকদের মধ্যে সাড়া ফেলে দিয়েছেন ইতিমধ্যে। এপ্রিল, ২০০৪ 'দিবারাত্রি কাব্য' পত্রিকার গল্প সংখ্যায় ওর একটি অসাধারণ গল্প পড়ার সুযোগ ঘটেছিল। এই প্রথম কোন লিট্‌ল ম্যাগাজিন এ সময়ের গল্পকারদের নিয়ে একটি সংখ্যার আয়োজন করলো। এতে প্রকাশিত ইন্দ্রানীর গল্পটির নাম 'কুইনের ফটোগ্রাফ- একটি ফ্যান্টাসি'। ন-মাসের ছোট্ট কুইন - এর বাবা-মা ভেবেছিল ওকে একটা অমল শৈশব দেবে, আরও দশজন মধ্যবিত্ত বাবা - মা যেমন ভাবেন প্রত্যুষ তার চেয়ে বেশি কী ভেবে ছিল কিছু? আসলে পার্টিশনের সময় ঢাকা ইউনিভার্সিটির কাগজপত্র পকেটে নিয়ে ক্যাম্পে ওটা ওর নিঃসম্বল বাবা বলতেন দেশগেছে বসে রিফিউজি

হতে যাব কোন দুঃখে? যার শৈশব নেই সেই তো আসল রিফিউজি। প্রত্যুষ তাই চেয়েছিল ওর ছোট্ট মেয়েকে একটি ঝকঝকে ছেলেবেলা দেবে। ওর স্ত্রী চন্দ্রানীও তো তাই চেয়েছিল। চায়নি কী? কিন্তু কোথা থেকে কখন যে কী হয়ে গেল– বিশ্বায়ন, পণ্যায়ন ও বহুজাতিক বাণিজ্য সংস্থার বিজ্ঞাপনী ফাঁদে অবশেষে ধরা দিতে হল মেট্রোপলিটন মধ্যবিত্তকে। প্রত্যুষ বা চন্দ্রানী তখন শুধু ব্যক্তি নয় আর। মেজোমামার এলগিন রোডের স্টুডিও-তে রাখা ন-মাসের কুইনের মুখটা ভালো লেগে যায় 'ম্যাকেঞ্জি অ্যান্ড ম্যাকেঞ্জি' কোম্পানীর আর্ট ডিরেক্টর পিযুষ মিত্রের। 'আপনার ভাগনিকে আমার চাই' পিযুষ মিত্র আরও জানান কুইনেন মুখটাকে তারা তাদের হ্যান্ডসাম কমিশন দেবে শুনে– মামাও লালায়িত হয়ে ওঠেন কখন, আর কখন যে তিনি দালাল হয়ে গেছেন টের পাননি নিজেও। বহুজাতিক পুঁজির হাত ধরে কলকাতা বদলেছে যত, তার চেয়েও বদলেছে কলকাতার মেট্রোপলিটন মন। প্রত্যুষ চাননি বহুজাতিক পুঁজির ফাঁদে পা দিতে না - না কুইনের ছবি বিক্রি করব, এ আবার হয় নাকি? ওইটুকু বাচ্চা - ওর হাসি। কান্না - নানা মেজদা, ছিঃ কুইনের হাসিকান্না বাজারে বিক্রি হবে? কোথায় যাচ্ছি আমরা? ''ছিঃ ছিঃ, ওইটুকু মেয়ের কান্নাহাসি বিক্রি করে টাকা! এর মর‍্যাল দিকটাও একবার ভাবুন। ততক্ষণে চন্দ্রানী অবশ্য নিজেকে বেঁধেছে বহুজাতিক পুঁজির ফাঁদে কিসের কী মর‍্যাল দিক? না মেজদা, তুই বলে দে আমরা রাজি। মান্টিন্যাশনাল কোম্পানির প্রোডাক্টের গায়ে আমার মেয়ের ছবি ভাবা যায়! এরকম চান্স যেন রোজ বাড়ি বয়ে আসে! নারে মেজদা, তুই হ্যাঁ করে দে— গোটা পৃথিবীর ঘরে আমার মেয়ের ছবি ঢুকে পড়বে।'' প্রত্যুষ বারবার বোঝাতে চান কেন বুঝছ না, পৃথিবীতে একদল লোক আছে তারা কোনো কিছুই পবিত্র থাকতে দেবে না। আমাদের বাচ্চাদের হাসিকান্নাটুকুও না। কিন্তু ততক্ষণে বাগবাজারে তাদের ছোট্ট সংসারে যে ফাটল ধরেছে তা জানে না প্রত্যুষ। উকিলের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে চন্দ্রানীর। গল্পটা এগোয়– একটা ঘরের মধ্যে আরেকটা ঘর একটা কলকাতার মধ্যে আরেকটা কলকাতা যেভাবে এগোয়- ঠিক সেভাবেই।

কয়েক বছর আগে লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়নের কোনো একটি পত্রিকার টেবিলে রাখা বইয়ের মধ্যে থেকে মায়ানক্‌শা' (২০০৪) তুলে নিয়ে উপহার দিয়ে ছিলেন প্রদীপ। গল্পকার প্রদীপ সামন্ত (জন্ম১৯৬৫)। জুলাই - ডিসেম্বর ২০০৪ 'দিবারাত্রির কাব্য' গল্প সংখ্যায় 'শোলমাছের টক' শিরোনামের একটি ছোট্ট ছোটগল্প পড়েছিলাম প্রদীপের। আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়ের সাপেক্ষে গল্পটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। সন্ধ্যে ছ-টার আগে - পরে শুরু হওয়া গল্পটা কলকাতার ভূতুড়ে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে নগরীতে দল বেঁধে নামা দুপুর রাতের দিকে– যদিও হাইড্রান্ট খুলে দিয়ে কুষ্টরোগী তখনও চেটে নেয়নি জল। কমপিউটারের মুখোমুখি অপূর্ব : মনিটরে সবুজ ক্ষেত আঁকল অপূর্ব। সমস্ত স্ক্রিনজুড়ে ধানের গাছ। তাদের মাথায় ঢেউ খেলানো আলো - আঁধারি। চোখ জুড়িয়ে যায়। আবেশে চাখ বুজে আসে। সারা বাড়ি ফাঁকা। কেউ নেই। অভীপ্সা ফিরবে সেই সাতটার পর। ততক্ষণে মনিটরে কখনো জুম হয়ে আসছে ছেলেবেলার ধানক্ষেতের মাঝে সরু আলপথ, লাটাই হাতে ছোট্ট ছেলে। কখন বা মনিটরে এনলার্জ হয়ে উঠেছে ধানকাটা মাঠ। স্ক্রিন থেকে এইমাত্র সব ধান কেটে নিয়েছে অপূর্ব। বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তি বনাম জীবনের এ এক লীলাকে সত্য শুধু নয় - আধুনিক পৃথিবীর আবহমান সত্যের মুখোমুখি এভাবে আমাদের দাঁড় করিয়ে দেন প্রতীপ। কলকাতার মেট্রোপলিটন মুখ আর মুখোশের দ্বন্দ্ব তখন সামনে চলে আসে সহসা।

চলমান দশকের একজন উল্লেখযোগ্য গল্পকার বিকাশকান্তি মিদ্যা (১৯৬৮)। 'পরিচয়', 'দিবারাত্রির কাব্য', 'নবান্ন', 'কালি ও কলম' প্রভৃতি পত্র - পত্রিকার প্রকাশিত ওর গল্পগুলো ইতিমধ্যেই আকৃষ্ট করেছে দীক্ষিত পাঠকদের মনোযোগ। সপ্তর্ষি প্রকাশন থেকে প্রকাশিত ওর প্রথম গল্প সংকলন 'বদল বৃত্তান্ত' (২০০৮) নিয়ে যদিও তেমন আলোচনা চোখে পড়েনি। দ্রাঘিমা অক্ষাংশের একটি নির্দিষ্ট ভূগোলে বিকাশের গল্পের চরিত্রদের চলা - ফেরা, বলা - কওয়া - প্রান্তিক সুন্দরবনের স্থানিকবৃত্তে সেই মানচিত্র সীমায়িত। সেই গল্পগুলো নয়- বিষয়গত কারণে এবারের 'রূপকথা' -য় (শারদ সংখ্যা ২০০৮) প্রকাশিত বিকাশের 'নগর - দর্শন' গল্পটিকে আমরা টেনে নেবো আমাদেরই আলোচনার মাধ্যাকর্ষণে। গল্পটির নির্মাণগত ত্রুটিকে স্বীকার করে নিয়েও পাঠক যদি এগিয়ে যান- তাহলে, দুই ছাবালের মা ছিমতী তুলসীবালা মোন্ডলের দেখা কলকাতার মেট্রোপলিটন মনের নতুন দিশা খুঁজে পেতে পারেন। গড়িয়া স্টেশন বাজারের মাছ ব্যাপারী- জা-র ভাইয়ের বাড়িতে কয়েকদিন থাকা ছাড়া তুলসীবালার কলকাতা দেখা হয়নি সেভাবে– অথচ না দেখা সেই কলকাতাও তুসীবালাদের টানে। বনে বাঘ, গাঙে কুমীর, খাটে ভাতার, হাঁড়িয়ে আ- ভাতের সেই কুমিরমারী থেকে গাবজানো পরাণ মন্ডল তাকে কোনোদিন দেখতে নিয়ে যায়নি কলকাতা। কোলকাতায় য্যাকোন আঙ্গার মতো গরীব জোয়ান মদ্দ ধরে তাই কেউটে খাসি করে দিচ্ছে। তুই আমারে খাসি হোতি কস্!...তাইলে য়্যাতো অস্ ক্যানো কোলকেতা দেখার? ''২১০ টাকা হাতে ধইরে গরিব পুরুষগুলোর বাপকেলে ডিম দুটো কেড়ে নেয়''- এই ছিল পরাণের ভয়। তারপর জীবন গড়িয়েছে স্বাভাবিক নিয়মে। চার মেয়েকে পার করার ফাঁকে ফাঁকে কার্তিক গণেশকেও আইবুড়ো রাখেনি তুলসীবালা - পরাণ মন্ডল। ছেলেরা আর ভাত দেয় না– তাই তাকে কলকাতায় আসতে হয়েছে ঝি-আয়ার কাজ করতে। কলকাতা এ শহরতলীতে আয়া সেন্টারগুলোর এখন বেশ রমরমা। অনেক পেশা লুপ্ত হয়ে গেলেও কলকাতা তার চতুর মধ্যবিত্তকে এখন দিয়েছে এক নতুন পেসার হদিশ– আয়া সেন্টারের ম্যানেজার। বাড়তি খরচের ভয়ে ব্যবহারজীবী কলকাতায় স্বামী - স্ত্রী চাকুরেরা তাই সরাসরি গ্রাম থেকে নিয়ে আসতে চান কাজের লোক। তাদের টিউব বেবিকে ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলে পাঠানো থেকে শুরু করে বাসনমাজা, ঘরমোছা সবই করতে হয় এদের– ঠিকে ঝি-র পদটা বিলুপ্ত হয়ে যায় তখন। তুলসীবাবা কলকাতায় এসেছিল এই দ্বিতীয় সূত্রে। সে অবশ্য জেনে এসেছিল- কলকাতায় বয়স কমানোর বড়ি পাওয়া যায়, ভুঁড়ি কমানোর তেল, এমন কি বুড়ি - মাগীর ছাবাল হওয়ার ইন্‌জাশন। শহরের নোকের মতো পেট ছোটো, ভুঁড়ি বড়ো নয় তুলসীবালার, তুলসী শোলপেটা। এত ভারী ভারী বাড়ি মাটির ওবরে, মাটি বসে যায় না- এসব প্রশ্ন এবং আরও কতো বিস্ময় নিয়ে তুলসীবালা কাটিয়ে দেয় তার নতুন কর্মজীবনের কিছুদিন। টি ভি -তে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে সে। কোনোটায় হাসে, কোনোটায় কাঁদে, আবার কোনোটায় লজ্জার মরি মরি ভাব। কেবল্ - কানেকশন্ অফ হয়ে গেলেও ঝিলমিল- ও বাদ দেয়না তুলসীবালা- ওটা ওর কুমিরমারীর নোনা জলের সোন্দর ঝিলমিল যেন। দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে যায়েঙ্গে দেখে অবশ্য লজ্জালতা তুলসী দিদিমড়িকে বলেছিল ওসপ্ আঙ্গার কি আর মানায়! আঙ্গার ফুল শুইকে গেচে, বালা - বাচ্চা আর হবেনি। যাকোন শুধু পেটের টান। হ্যাঁ পেটের টানেই কলকাতায় আসে তুলসীবালারা। টিভির সঙ্গে সঙ্গে মিক্সির হাতের মুঠোয় ওই টেপাকলটা তুলসীকে আরও টানে। মোল্লাখালির হাটে দেখা যাদুকরের হাতের কাম্মুকের হাড়- ছোঁয়ালেই ডিম হয়ে যায় ফুল, দড়ি হয়ে যায় সাপ। কিন্তু রিমোট - টা হাতে নিতে ভয় পায় তুলসীবালা। সেদিন মিক্সির বাবা - মা তাড়াহুড়োতে ভুলে গেছে টিভি-র তালা বন্ধ করতে। তুলসীবালার

সামনেই কাম্মুকের হাড়। টিপ দিতেই ন্যাটো মাগীর নায, তার থেকে বল, বল থেকে ছাবাল - মেয়ের সাপের মতো সঙ্ক লাগা- মা গো মা, ফুল শুকনো তুলসীলতাও যেন গাছের গোড়াতে রস খুঁজে পায়।...তেল মেখে এট্টা গোরো মোটা মাগীর ভুঁড়ি তুড়ি মেরে ফক্ করে কমে গেল। একটা বুইড় মাগীর লোল চামড়া টান হয়ে বুক দুটো ফুলে উঠলো- এসব দেখতে দেখতে কুমিরমারীর গ্যাস্টিকির রুগী পরাণ মন্ডলের বুড়ি-র আপশোর হয় কেন যে এটু বয়স থাকতি সংসারটায় অভাব হয়নি, ছাবাল - পোন কেন যে আগে ভাগে শত্তুর হয়নি। আদরের নাতি রাজাকে কুকুরে কামড়ানোর খবর শেষ পর্যন্ত কুমিরমারীর জন্য তুলসীবালার মনটাকে উতলা করে তোলে—এবার দিদিমণির কাছ থেকেও প্রয়োজনীয় অনুমতি মেলে। কিন্তু শিয়ালদা থেকে ধামাখালির বাস ধরতে গিয়ে কলকাতার আরও একটা রূপকে দেখে ফেলে তুলসীবালা- ছাতা আর গামছা কেনার দু'শ টাকা ততক্ষণে হাওয়া। কলকাতার আরও কত কী দেখতে বাকি আছে তুলসীবালার কিন্তু দেখতে চায় না তুলসীবালা– দাদাবাবুর অনুরোধেও নয়- হাঁড়ির ভাত এট্টা টিপলি বোজা যায়। এভাবেই সে বুঝে নিয়েছে কলকাতাকে— তিলোত্তমার সবটুকু না দেখে, এভাবেও বুঝে নেওয়া যায়? হ্যাঁ তুলসীবালারই পারে - পারে সবটুকু বুঝে নিতে।

সৌতি মিত্র (জন্ম ১৯৭২) চলমান দশকের গল্পকারদের মধ্যে বেশ পরিচিত নাম। গল্পের কারণেই নতুন দশকের যারা যারা ইতিমধ্যেই আলোচিত হওয়ার দাবি রাখেন– তাদের মধ্যে সৌতি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। 'সৌতি মিত্র' নামটার মধ্যে অবশ্য একটি গোপনীয়তা আছে কোথাও - আশা করি ধীরে ধীরে প্রকাশিত হবে যে গোপনীয়তার সবটুকু আবরণ। আমার পড়ার ওপর প্রথম গল্প 'শবভাষ'। প্রকাশিত হয়েছিল 'দিবারাত্রির কাব্য' -এর কথাসাহিত্য সংখ্যা (২০০৭)। তারপর খোঁজ নিতে শুরু করি। আমারই প্রয়োজনে ছিল যে খোঁজ - তাই আজ সকালের হয়ে উঠবে। নতুন পৃথিবী, নতুন কলকাতা, নতুন সময়ের প্রবর্তনাকে– এই নতুন দশকের গল্পকার-রা ধরে রাখছেন তাদের গল্পে– নতুনতর শৈলীতে– নতুনতর গল্পভাষায়, একজন পাঠক হিসেবে তা শুধু মুগ্ধতা নিয়ে দেখে যেতে হয়। সদ্য পড়া সৌতি-র একটা গল্পের নাম 'রিং - টোন'। প্রকাশিতও হয়েছে এই দশকে নতুন প্রকাশিত একটি লিটল ম্যাগাজিন 'নির্জন স্বাক্ষর' -এর (জানু-জুন, ২০০৮) প্রথম সংখ্যায়। মিস্‌ড কল প্রজন্মের গল্প 'রিং টোন'। সদ্য কলেজে ঢোকা একটি মেয়ে এই গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র। একটি রিং টোন তাড়া করে ফিরছে তাকে। সেন্ডার নেম হিসেবে লেখা ছিল 'অসীম'। কে এই অসীম? খুঁজে পাওয়া যায়নি তাকে। এমন কী ওই সেন্ডার নম্বরে ফোন করেও কখনো যোগাযোগ করা যায়নি কারুর সাথে। অথচ সেই না- প্রেমিকের জন্য গল্পের নামহীন তরুণীর একটি স্মৃতির মানুষী দূর্বলতা প্রণয়ের পথ থেকে অবারিত করে। ভয়ংকর এক প্রেমহীন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে আজকের মিসড্ কল মোবাইল প্রজন্ম। কিছুদিন আগে মোবাইল হারিয়ে গিয়েছে বলে অমোষ মৃত্যুকে বেছে নেওয়া দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ ছাত্র তার সুইসাইড্ নোটে লিখেছিল মোবাইল ছাড়া জীবন অর্থহীন। লাশকাটা ঘরে, মর্গে কেউ অবশ্য জানায়নি এই সুসমাচার - জীবন নয়, নারী নয়, প্রকৃতি নয়, সুন্দরও নয়- ছেলেটা ভালোবেসে ছিল মোবাইলকেই। একটি সর্বভারতীয় দৈনিকে প্রকাশিত খবরটা আজ মনে পড়ে যাচ্ছে অনেক বেশি করে। সৌতি এই প্রজন্মের মনকে বুঝতে চেয়েছেন। একটি সেল - ফোন বা সেই সেল - ফোনের কোনও রিং-টোনও যে পূর্ণ করে তুলতে পারে প্রণয়ের এতো ব্যর্থ আয়োজন– কলকাতার মেট্রোপলিটন মনের মধ্যেও যে নতুন প্রজন্ম ভিন্নতর কমপ্লেক্স, সম্পূর্ণ নতুনতর কোনো ক্রাইসিস নিয়ে বেড়ে উঠছে– সৌতি তা ধরতে চেয়েছেন ওর গল্পে। দিশাহীন এই প্রজন্মের জন্য কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূর থেকেও বোধ করি আসবে না কোনো সূর্যকরোজ্জ্বল ভোর। ওদের স্বপনের হাতে দেবে না ধরা- পৃথিবীর যত ব্যথা - বিরোধ বাস্তু। সৌতি নয়, সময় নিজেকে লিখছে এখন।

রাজু দেবনাথ (জন্ম ১৯৭৪) এ সময়ের (২০০৮) একজন ব্যতিক্রমী ছোটগল্পকার। ওর পেশা এবং নেশা ওকে সমকালের গল্পকার থেকে ব্যতিক্রমী হতে সাহায্য করেছে। রাজু ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী - ফলত: ওর গল্পেও এসে যায় ওই ছবি লেখা। যতটুকু পড়েছি তাকে— দেখেছি, রাজু আসলে উত্তর - ঔপনিবেশিক আমাদের এই নিও-আর্বাণিটিকে ধরতে চান তার গল্পের বয়ানে। খুব স্বাভাবিক ভাবে কলকাতার মেট্রোপলিটন মন নিয়ে তাই ওর গল্পের কারবার। 'গুড আর্থ অথবা আরও একটা সুরের জন্মে' - ২০০৪ -এ গল্পটা পড়েছিলাম মনে আছে। গল্পটা দিপ্রী রোহিতের গল্পই হতে পারতো কিন্তু দাম্পত্যের শুরুতেই একটি মেডিকেল টেস্ট ওদের মধ্যে এনে দেয় সিনথেটিক দূরত্ব। গল্পের এই মূল না - প্লটের সঙ্গে রাজু আশ্চর্য কৌশলে ভয়ংকর ভাবে নাগরিক পাখি একটি কাকের প্রতীকী উপস্থিতিকে ব্যবহার করেছেন। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ও দার্শনিক - বীক্ষা। নাগরিক মধ্যবিত্তকে গল্পটি শেষপর্যন্ত আসলে দাঁড় করিয়ে দেয় পরম কোনো বিস্ময় চিহ্নের মুখোমুখি। 'দিবারাত্রির কাব্য' (জানুয়ারি - জুন, ২০০৭) কথাসাহিত্য সংখ্যার প্রকাশিত 'নীল পাখি, নীল ঘর এবং একটি হলুদ লিফ্‌ট' গল্পটি আমাদের বর্তমান আলোচনার সাপেক্ষে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। অফিস থেকে ফিরে রোজ রাতে আরও একটা অফিস সাজিয়ে বসে আই-টি ডেট করে তোলাটা জরুরি। নিভাও প্রতি রাতে খাওয়ার পর নিজের বিজনেসের হিসেব নিয়ে বসে– ডিভিডি-তে চালিয়ে দেয় সদ্য সংগ্রহ করা নীল ছবি। যেরকমই হোক না কেন ছবি দেখার অবশ্য সময় পায় না নিভা। শুধু ভেসে আসে আঁশটে আওয়াজে যে হিসাবে আরও বেশি করে মনোযোগ দিতে পারে। এভাবেই ওদের তেরোতলার ফ্ল্যাটে রাত আসে– রাত যায়। পাশের ঘরে রিনি কখন বড়ো হয়ে উঠেছে সেদিকে এতদিন খেয়াল ছিলনা পিনাকীর। সে কমপিউটারে ছবি আঁকে, নেটে বন্ধুত্ব করে দূর ভূগোলের না দেখা বন্ধুর সাথে। ওর অফিস ম্যানেজমেন্ট চিঠিটা ধরিয়ে দিয়েছে বলেই পিনাকী আজ এত কিছু জানালো অসময়ে ফ্ল্যাটে পৌঁছে। তারপর বন্ধুহীন, চাকরিহীন অবকাশে আত্মজর সঙ্গে চিরন্তন সম্পর্কটা নতুনভাবে ফিরে পায় পিনাকীর অটোমোবাইল মেট্রোপলিটন মন যাকে হারিয়ে ছিল একদিন। কোম্পানি ওকে লিখেছিল আপনার মাথার মধ্যে কোম্পানি ছাড়া অন্যকিছু থাকা উচিত নয়। তাতে কোম্পানির প্রোডাকশন ফল করে। গতমাসে আমাদের মার্কেটিং ০.০০০৫ শতাংশ ফল করেছে। আপনার ব্রেনের টোটাল স্পেসের একটা অংশে অন্য অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত ইতিহাস লোড আছে। সেজন্য কোম্পানি আপনার ব্রেনকে সম্পূর্ণ কাজে লাগাতে পারছে না। তাই আপনাকে আমরা...। পিনাকী কিছু রাখবে না তার মস্তিস্কে, শুধু রিনিকে রাখবে। আর সব ডিলিট করে দেবে। ছোটোবেলার চামগুলতি, হাফপ্যান্ট পরা স্কুলবেলা, চন্ডীমন্ডপ, খড়ের গাদায় লুকিয়ে মাসিক মেয়েকে প্রথম খাওয়া চুমু– সব ডিলিট করে পিনাকী ডিলিট হাউসে ঢুকে। অফিস থেকে ফিরে দেখা বাবার মরা মুখ, রিনির আঁকা প্রথম অয়েল প্রেন্টিং সবকিছু ডিলিট হয়ে যায়। তখন ডিলিট হাউসের লিফ্‌ট ৪৫-৪৬-৪৭ ছাড়িয়ে ৭০-৮০ তে পৌঁছায়। পিনাকী চিৎকার করতে থাকে আমি নামব প্লিজ'। স্টপ।' লিফ্‌টের গতি বেড়ে যায় সহসা। বহুতলের ছাদ ফুঁড়ে শূন্যে মাথা তোলে লিফ্‌ট। পিনাকী ঠিকরে পড়ে মহাশূন্যের মধ্যে। কাকাতুয়ার হাতের উপর বসা ছেলেবেলার সেই পাখিটা তিনবার চক্কর খেয়ে তখন এসে বসে

পিনাকীর হাতের উপর। পিনাকী ফিরতে চাইছে তার ছেলেবেলার আলুখেতের মধ্যে– অথচ নামতে পারছে না কোথাও। আমরাও যারা ফিরতে চাই কখনো কখনো ছেলেবেলার ছোট্ট নদী, মেঠোপথ আর আলুক্ষেতে– রাজু কী আত্মসংকটে দীর্ণ সেই নাগরিক মধ্যবিত্তের কথা বলছেন? না কী উন্নয়ন, আই-টির হাইটেক আর্বাণিটির মধ্যে ওত পেতে আছে যে নতুন কোনো ক্রাইসিস - রাজু দেবনাথ সেই আগামী পৃথিবী, আর ও কুড়ি কুড়ি বছরের পর আরও তিলোত্তমা কোনো কলকাতার গল্প বলছেন আমাদের।

যত পড়ছি তাকে, মুগ্ধ হচ্ছি ততই। যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে আজকের বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাস— সেখানে দাঁড়িয়ে যা খুসি লিখে, সেইসব ছাইপাশকে আর যাইহোক ছোটোগল্প বলে চালানো যাবে না। আশার কথা আমাদের গল্পভুবনে সাক্যজিৎরা এসে গেছেন! কেউ কেউ দশকের নিরিখে বিচার্য হন আর কাউকে ঘিরে দশক চিহ্নিত হয়। যদিও নতুন সহস্রাব্দের চলমান এই দশকের পূর্ণতায় ঘাটতি রয়ে গেছে পৃথিবীর পরিক্রমণের আরও দুটো রাউন্ড, তবু আমার ব্যক্তিগত পাঠ ও পাঠকৃতিতে মনে হচ্ছে শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য (জন্ম ১৯৮২) -এর নাম চিহ্নিত হবে এই দশক। ২০০২ -এ 'পরিকথা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ওর প্রথম গল্প 'আক্রান্ত'। তারপর 'ভাষাবন্ধন', 'একালের রক্তকরবী', 'এবং মুশায়েরা' 'দিবারাত্রির কাব্যে' পড়ছি তাঁকে— নিজেকে সমৃদ্ধ করবো বলেই। দিল্লি ইন্ডিয়ান স্টাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের এই ছাত্রটি সম্ভবত চলমান দশকের সবচেয়ে বয়: কনিষ্ঠ গল্পকার। ওর 'কৃষ্ণ' গল্পটিকে ঘিরে আমাদের আজকের আলোচনা। গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল 'ভাষাবন্ধন' -এর উৎসব (২০০৫) সংখ্যায়! মহাভারতের দ্রৌপদী মিথ কে যেভাবে কবি সব্যসাচী দেব তুলে এনেছিলেন ওঁর 'কৃষ্ণ' কবিতায়— শাক্যজিৎ গল্পে সেই মিথকে করে তুলেছেন পুন: নির্মিত। বাংলা গল্পভুবনে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বয়ম্বর সভা'-র একমাত্র তুলনীয় হতে পারে গল্পটি। অখিল, সুধাংশু আর বিনয়ের পাপের গল্প, পুণ্যের গল্প, দৃশ্যের গল্পটা শেষপর্যন্ত হয়ে উঠেছিল পুরুষের আবহমান দ্যূতক্রিয়ার গল্প — নারী যেখানে হয়ে ওঠে অক্ষক্রীড়ার পণ– তখন সময়ের অন্তহীন হাতে এসে সবই নেয়– নারীকেও নিয়ে যায়। ১৩৬৮ জৈষ্ঠ্যের 'স্বয়ম্বর সভা' গল্পটা বদলে যাওয়া কলকাতা, বদলে যাওয়া সমাজ - অর্থনীতি ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় শাক্যজিৎ এর হাতে 'কৃষ্ণা হয়ে ওঠে। অন্ধকার নেমে আসেনি চোখে, চোখের পাতার মতন ধীরে, শতশত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বরও ছিল না— তবু একটা ভিন্নতর সন্ধ্যা এসেছিল সেদিন ট্রায়াঙ্গুলার পার্ক, পন্ডিতীয়া রোডের আকাশ জুড়ে। সেদিন বিকেলে পাতা ঝরেছিল সত্যিই– বৃষ্টি হয়েছিল তারও আগে। ঝরাপাতার শব্দ আর গাছের ভেজা গুঁড়ির গন্ধ তখন একসাথে মিশে যায়। মেঘলা আকাশে বাড়ীর ভেজা ছাদের গন্ধে বিকেল শেষ হয়ে গেলে– মেঘ তার জড়তা ভাঙে, গাছেদের ভেজা গুড়িতে তখনও জড়িয়ে আছে ওদের মন খারাপ– মীলা সন্ধ্যের গন্ধ পায়। গৌতম সন্ধ্যের গন্ধ নায় না, সন্ধ্যে দেখে- এভাবেই ওদের জীবন তেকে একটা একটা সন্দ্যে হারিয়ে যায়। কলকাতার যে পথ পাল্টায় রোজ-সেই পথের অলি-গলি পেরিয়ে মীলা বাড়ি ফেরে- ওর প্রেমিক কখনও কখনও ফেরে মীলার সঙ্গেই। মীলাদের বাড়ির সংখ্যাহীন ঘরগুলো যেন এক চলমান ভুলভুলাইয়া। পাশে অন্ধকার ভূতের মতন ঝোপঝাড় ঘেরা এঁদো পুকুর। বাড়ির দারোয়ান সনাতন সেখানে ছিপ ফেলে– তারপর পরম হিংস্রতায় তোর পেট খাবো, তোর বুক খাবো...চিবিয়ে চিবিয়ে চুষে চুষে বলতে বলতে কাটতে থাকে মাছ। সনাতনের নামটার মতো ওর ছিপ, ওর মাছ, সাপ লুডোর চাল দেওয়াকে শাক্যজিৎ প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ব্যবহার করেন ওর গল্পে। রক্তকরবী-র নন্দিনীর কাছে যেভাবে এসেছিল নীলকণ্ঠ পাখির পালক— আগে অনেকবার আসলে মীলাদের ভূতের মতন অন্ধকার ঝোপের বাগানে আর আসে না কোনো নীলকণ্ঠ পাখি। গৌতম মীলাকে নিয়ে যাবে দূর গ্রামে ওর মামার বাড়ি– সেখানে একসাথে থাকে সকলে, উঠোনে ধানের গোলা, দালানে লক্ষ্মীর পা। সেখানে যাওয়ার একটা পুরানো টিকিট ছুঁয়ে ছুঁয়ে মীলা কতোবার মনে মনে ওদের গোলকধাঁধা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে– এখনও সেই রেল টিকিটের স্পর্শ সে হাড়ের মালার মতো জড়িয়ে রাখে চুলে। আর কখন যেন গৌতমও হয়ে ওঠে সনাতনের শেষ না হওয়া সাপ লুডোর সঙ্গী। এক হাত-ই খেলতে চেয়েছিল গৌতম কিন্তু লুডোর মইগুলোও আজ সব সাপ হয়ে উঠেছে। গিলে ফেলছে সব। নামিয়ে দিচ্ছে নীচে– সনাতনের নষ্ট চোখ তখন উল্লাস ফেটে পড়তে চায় এগাতে গেলে খুবলে নেবো শালা। মেঘ ভাঙছে তখন, আকাশ ডাকছে, ভুতুড়ে গাছেরা দোলাচ্ছে মাথা গৌতম বাজী ধরছে বাজী-সারা বাগান তখন অন্ধকার। তারমদ্যে পুকুর পাড়ে একটা ছায়ামূর্তি। আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসছে। তবু প্রাণপণে চোখ বন্ধ করে ছক্কার দিকে কংপা হাত বাড়ায় গৌতম। শাক্যজিৎ, একটি গল্পকে লেখেন না শুধু, কলকাতার সমকালীন আর্থ - সামাজিক - রাজনৈতিক এবং অবশ্যই সংস্কৃতিতে বাস্তবতার সঙ্গে মিথিক সত্যকে অন্বিত করে দেন। শাক্যজিৎ, আমার ছাত্র বয়সে একবার খুঁজতে গেছিলাম ২০২নং রাসবিহারী এভিনিউ। পকেটে সেদিন ভীরু কোনো কবিতা ছিল না যদিও। আজও কোনোদিন যদি সন্ধ্যার ট্রায়াঙ্গুলার পার্ক, পন্ডিতীয়ায় যাই মীলাদের বাড়িটা খুঁজি। দেবারতি মিত্রের নয়– মীলার অন্ধস্কুলের ঘন্টার ধ্বনি - শব্দ - গন্ধ খুঁজি। খুঁজি এখনও।

নিশ্চিত ভাবে জানি, এই আলোচনায় আসন পেতে দেওয়া গেল না নতুন সময়ের, নতুন এই দশকের অনেক নতুন গল্পকারকে। অনেকেই নিজেকে প্রকাশিত করেছেন, ছড়িয়ে যেতে পেরেছেন পাঠক চেতনায় কিন্তু এও তো নিশ্চিতভাবে জানি সংকোচের বিহ্বলতায় এখনও অনেক গল্পই রয়ে গেছে প্রকাশের অপেক্ষায়। সময়ের বিস্তর ব্যবধানে বসে একদিন সেইসব গল্প পড়বে পরবর্তী সময়ের পাঠক। কলকাতা কী সেদিন সত্যি সত্যি কল্লোলিনী তিলোত্তমা হয়ে উঠবে- সেদিনের পাঠকের হৃদয়ের কাছে? অরব অন্ধকারের ঘুম থেকে উঠে কল্লোলিনী তিলোত্তমার গল্পই সে 'পড়িবে' আবার।